মার্ক্সীয় দর্শনের সূচনাপর্ব-৬

বিরঞ্জন রায়

পরিশিষ্ট

এপিকুরসের ধর্মতত্ত্বের বিরুদ্ধে প্লুতার্কের তর্কের পর্যালোচনা

প্রবন্ধটির শুরুর দিকেই আমরা মার্ক্সের ডক্টরাল থিসিসটি রচনার সামাজিক-সাংস্কৃতিক আবহটি বর্ণনা করেছি। মার্ক্সের থিসিসটির বিষয়, দেমক্রেতীয় ও এপিকুরীয় প্রকৃতি-দর্শনের পার্থক্য। সেখানে স্বভাবতই এপিকুরসের নীতি-দর্শন আলোচনার সুযোগ ছিল না। কিন্তু মার্ক্স সমসাময়িক বিতর্কে সাড়া দিয়ে থিসিসটির পরিশিষ্ট হিসাবে নীতি-দর্শনের আলোচনা জুড়ে দিয়েছিলেন। এখানে এপিকুরসের নীতি-দর্শনের আলোচনাটি এসেছে, এপিকুরসের নীতি-দর্শনের সমালোচক প্লুতার্কের সমালোচনার জবাব রূপে। প্লুতার্ক ছিলেন একজন প্লাতনবাদী জীবনীকার। তিনি দীর্ঘদিন ডেলফির মন্দিরের ভবিষ্যৎ-বক্তাদের ভবিষ্যৎবাণী ব্যাখ্যা করার যাজকীয় দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ছিলেন এপিকুরীয় নীতিবিদ্যার ঘোর সমালোচক। পরবর্তী ধর্মতাত্ত্বিকেরা এপিকুরসের বিরুদ্ধে প্লুতার্কের কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন। শুধু ডক্টরাল থিসিস নয়, মার্ক্সের এপিকুরস সম্পর্কিত নোট বইগুলোতেও প্লুতার্কের এ-বিতর্ক নিয়ে আলোচনা আছে। এসব আলোচনায় মার্ক্স এপিকুরস-প্লুতার্ক বিতর্কেই সীমাবদ্ধ থাকেন নি; প্লুতার্কের বনামে তিনি নিজের সময়ে প্রচলিত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মতাত্ত্বিক ধারণাগুলিরও (যেমন ঈশ্বরের অস্তিত্ব কিংবা আত্মার অমরত্ব) সমালোচনা করেছেন।

ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত ধারণা, ঈশ্বর বিশাল ভয়াল এক ব্যক্তি বিশেষ। যার সামনে নতজানু হয়ে, যুক্তি সমেত সব বিসর্জন দিয়েই মানুষ সুখী হতে পারে। হাজার হাজার বছর আমাদের পূর্বপুরুষেরা তার সামনে ভয়ে নতজানু হয়েছেন। আমরাও তেমনি হচ্ছি। প্লুতার্ক সমেত সমস্ত ধর্মবেত্তারাই মানুষকে দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত রাখার জন্য, পরকাল, নরক– এসব ভীতিজনক শাস্তির লোমহর্ষক কাহিনী বয়ান করে আসছেন। শৈশব থেকে শেখা এসব ভয় মানুষের অন্তর্জগতে বাসা বাঁধে। যখন মানুষ এ দুর্দমনীয় অন্তঃস্থ ভয়ের তাড়নায় চালিত হয়, তখন তার আচরণ একটি জন্তুর মতোই; যুক্তিবুদ্ধি চালিত মানুষের মতো নয়। আর জন্তুদের কিভাবে দাবিয়ে রাখা হয়, তা সত্যিকার মানুষ সম্পর্কিত বিষয় হতে পারে না। মার্ক্সের মতে মানুষকে ভয়ের শৃঙ্খলে বন্দি রাখাটাই মানবতার বিরুদ্ধে ধর্মের সবচেয়ে বড় পাপ।

এপিকুরস বলেন, যখন মৃত্যু থাকে, তখন আমরা থাকি না। তিনি দেহ-বিচ্ছিন্ন কোনো অমর আত্মায় বিশ্বাসী নন। তার মতে আত্মাও দেহের মধ্যে বিশেষ ধরনের পরমাণুর বিশেষ সমাবেশ মাত্র। মৃত্যুর পর এসব পরমাণুসমূহ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অর্থাৎ আত্মার অস্তিত্ব থাকে না। প্লুতার্ক সমেত প্রায় সমস্ত ধর্মতাত্ত্বিকরাই আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী। এপিকুরস দেবতাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। তবে সেই দেবতারা মানুষের ব্যাপারে উদাসীন। এপিকুরস সম্পর্কে প্লুতার্কের অভিযোগ, তিনি যেমন মানুষ সম্পর্কে নিস্পৃহ আত্মতুষ্ট দেবতার কল্পনার মাধ্যমে মানুষকে একজন দয়ালু ঈশ্বর থেকে বঞ্চিত করেছেন; তেমনি আত্মার অমরত্বের ধারণা খারিজ করে দিয়ে মানুষের অমরত্বের আকাঙ্ক্ষাকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। এভাবে এপিকুরস মানুষের জন্য আনন্দ লাভ অসম্ভব করে তুলেছেন। অথচ তিনি প্রচার করেছেন তার দর্শনের লক্ষ্য মানুষের আনন্দ।

মার্ক্স এপিকুরসের পক্ষ হয়ে (প্লুতার্কের) আত্মার অমরত্বের ধারণাটিকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। মৃত্যুতে আত্মার 'সমাপ্তি' হয়, এ কথার পরিবর্তে প্লুতার্ক বলতে চান, মৃত্যুতে আত্মা 'পরিবর্তিত' হয়। কিন্তু আত্মার অমরত্ব বলতে বুঝানো হয়, মৃত্যুর পরও ব্যক্তিটি, ব্যক্তিটিই থেকে যায়; শুধু তার দেহ থাকে না– এই মাত্র। যদি ব্যক্তিটি, ব্যক্তিটিই থেকে যায়, তবে তাকে 'পরিবর্তন' বলব কেন ? জিনিসটি অপরিবর্তিতই রয়েছে, শুধু চোখের আড়ালে আছে মাত্র। প্রকৃত পরিবর্তন তো গুণগত পরিবর্তন। কোনো গুণগত পরিবর্তন ছাড়া পরিবর্তন বলাটা একটা কাল্পনিক দূরত্ব তৈরী করা মাত্র। (তাই যদি আত্মার পরিবর্তনকে স্বীকার করা হয়, তবে এর যৌক্তিক ফলশ্রুতি, আত্মা অমর হতে পারে না। আর যদি বলা হয় আত্মা অমর, তবে মৃত্যুতে আত্মা পরিবর্তিত হয় বলা অর্থহীন।) (বৌদ্ধ দার্শনিকগণও শাশ্বত আত্মা বিরোধী যুক্তি উত্থাপন করেছিলেন। তাদের মতে, যা নিজে পরিবর্তিত হয় না, তা অন্য কিছুকেও পরিবর্তন করতে পারে না। 'কারণ' নিজে পরিবর্তিত হয়েই অন্য পরিবর্তনের কারণ হতে পারে। তাই অমর অপরিবর্তনীয় আত্মা মানুষের কর্মের কারণ হতে পারে না। এমন আত্মা পাপ-পূণ্যের ভাগীদার হতে পারে না, এজন্য শাস্তি বা পুরস্কার ভোগও করতে পারে না।)

কান্ট তার Critique of Pure Reason গ্রন্থে ঈশ্বর, আত্মা– এসব ধারণা যুক্তি দ্বারা খন্ডন করেন। আবার তিনিই তার Critique of Practical Reason গ্রন্থে যুক্তি দেন, জীবনযাপনের নৈতিক ভিত্তি হিসাবে এসব ধারণার সত্যতা রয়েছে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এমনই একটি যুক্তি, 'যেহেতু ঈশ্বরকে আমি নিজ মনে উপলব্ধি করতে পারি, তাই ঈশ্বর আমার জন্য বাস্তব'। মার্ক্স যুক্তি দেন, আমার কাছে টাকা না থাকলেও যদি আমি বিশ্বাস করি আমার লাখ টাকা আছে, তবে তা আমার জন্য বাস্তব। এখন এ বাস্তবতার বশবর্তী হয়ে যদি আমি দোকানে জিনিস কেনা শুরু করি, তবে দোকানী আমার এ 'টাকার বাস্তব বোধে' সন্তুষ্ট হবে কি ?

বাঙালি হিন্দুর কাছে শীতলাদেবীর অস্তিত্ব বাস্তব। এই শীতলাদেবীকে নাইজেরিয়ার 'ইয়োরুবা' জনগোষ্ঠীর কাছে নিয়ে গেলে তারা তাকে দেবতা বলে স্বীকার করবে না। তেমনি তাদের দেবতা 'ভুদু'ও বাঙালি হিন্দুর কাছে অদ্ভুত সামগ্রী বলে গণ্য হবে। এ-ধরনের দৃষ্টান্ত দিয়ে মার্ক্স সিদ্ধান্ত টানেন, 'এক দেশের দেবতার যেমন অন্য দেশে অস্তিত্ব নেই, তেমনি 'বুদ্ধির-দেশে'ও ঈশ্বরের কোনো অস্তিত্ব থাকে না।'

বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের অস্তিত্বের সমর্থনে আরেকটি যুক্তি তোলে ধরেন। তারা বলেন: মহাবিশ্বের সবকিছুই নিখুঁত ও পরিকল্পিত। সবই নিয়ম দ্বারা চালিত, কোনোকিছুই খামখেয়ালি নয়। এসবই একজন বুদ্ধিমান স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। মার্ক্স যুক্তি দেন উপরের যুক্তিটি বরং একজন বুদ্ধিমান স্রষ্টার অস্তিত্বকে অপ্রমাণিত করে।

সবকিছুই নিয়ম দ্বারা চালিত হলে একজন বাড়তি ঈশ্বরের কি প্রয়োজন? মার্ক্স বলেন, বিশ্বাসীরা বরং ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য উপরের যুক্তির বিপরীত যুক্তিটি হাজির করতে পারেন। 'যেহেতু এই পৃথিবী যৌক্তিকতাহীন, সে কারণে ঈশ্বর অস্তিত্ববান'। অর্থাৎ পৃথিবী যৌক্তিকতাহীন বলেই একজন যৌক্তিক ঈশ্বরের প্রয়োজন। অতএব, 'যৌক্তিকতার ঘাটতিই হচ্ছে ঈশ্বরের অস্তিত্ব'।

ঈশ্বরকে যেহেতু যুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না, তাই হেগেল ঈশ্বর ধারণাটিকে আরো যুক্তিসিদ্ধ ধারণা 'পরম ভাব' দ্বারা প্রতিস্থাপিত করেন। (স্মরণীয়, ব্রহ্মবাদী হিন্দু দার্শনিকেরাও যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পেরে 'পরম ব্রহ্ম' ধারণায় পৌছান। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে যেহেতু ঈশ্বর নেই, তাই বৌদ্ধ ও জৈন দার্শনিকেরা ঈশ্বর প্রতিষ্ঠার দায়মুক্ত ছিলেন। তারা বরং ঈশ্বর প্রসঙ্গে বিতর্কে নেমে ঈশ্বর বিরোধী যুক্তি উদ্ভাবন করেছেন।) ধারণাগতভাবে নাজুক এ-ঈশ্বরের প্রতি কটাক্ষ করে মার্ক্স বলেছেন, 'এ আবার কেমন মক্কেল, যাকে তার উকিল নিজের হাতে খুন করেই কেবল দন্ডের হাত থেকে বাঁচাতে পারে ?'

ডক্টরাল থিসিস পর্যায়ে মার্ক্সের দার্শনিক বিকাশ

আমরা দেখেছি, মার্ক্স বেড়ে উঠেছিলেন একটি বদ্ধ রাষ্ট্রে। কিন্তু সেখানে ফরাসি বিপ্লবের মুক্তির হাওয়া ঢুকে পড়েছিল। তাই ফরাসি বিপ্লবের শ্লোগান 'স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব'-র আদর্শ শৈশবেই তার মনে বাসা বেঁধেছিল। বিজ্ঞান এবং বস্তুবাদী দর্শন তার মানসিক বিকাশে নির্ণায়কের ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু সে বস্তুবাদ ছিল যান্ত্রিক, নিমিত্তবাদী। সেখানে আকস্মিকতার, মুক্ততার, স্বাধীনতার ঠাঁই ছিল না। এ-বস্তুবাদে প্রাণ ও মন-এর মতো জটিল বিষয়াবলির সন্তোষজনক ব্যাখ্যা ছিল না। বস্তুবাদের এ দূর্বলতার জন্য প্রাধান্যশীল হয়ে উঠেছিল দ্বয়বাদ। যেখানে প্রাণ ও মনকে বস্তু থেকে সম্পর্কহীন ভিন্ন বিষয় বলে ভাবা হত। অন্য সমাধানটি ছিল বস্তুতে প্রাথমিক গতি সঞ্চারক এবং প্রাণ ও মন সঞ্চারক হিসাবে ঈশ্বরের কল্পনা। খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের সঙ্গে তা সামাঞ্জস্যপূর্ণ। বস্তুবাদের অপ্রধান ধারাটি সর্বপ্রাণবাদ। আদিম বিশ্বাসের এ-দার্শনিক রূপটির প্রতিনিধি ব্রুনো, বুফোঁ প্রমুখ চিন্তাবিদরা। সর্বপ্রাণবাদ প্রাণের উদ্ভবের সমস্যাটি এড়িয়ে যেতে পেরেছিল, কিন্তু প্রাণকে রহস্যমুক্ত করতে পারে নি। সর্বপ্রাণবাদের সঙ্গে সর্বেশ্বরবাদের সম্পর্কটিও ঘনিষ্ঠ। তাই মার্ক্স সে বস্তুবাদী দর্শনে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তারপর তিনি যখন জার্মান ভাবাদর্শ অধ্যয়ন করেন, এর অগ্রসর চিন্তাপ্রণালী, বিশেষত হেগেলের দ্বান্দিক চিন্তার পদ্ধতি তাকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু জার্মান ভাবাদর্শেও সঙ্গে মিশে ছিল ভাববাদিতা ও ধর্মতত্ত্ব। কাজেই হেগেলের দর্শনের সঙ্গে তিনি একাত্মবোধ করতে পারেন নি। আমরা তরুণ মার্ক্স প্রসঙ্গে আলোচনায় বলেছি, দার্শনের প্রতি মার্ক্সের আগ্রহের পিছনে কার্যকর ছিল, সামাজিক বিষয়াবলী গবেষণার একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন। হেগেলের মৃত্যুর পর হেগেলীয়দের ডান ও বাম এ দুই শিবিরে ভাগ হয়ে যাওয়া নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। মার্ক্স যদিও বাম হেগেলীয়দের দলে যুক্ত হয়েছিলেন, তিনি তাদের মতো হেগেলের দর্শনকে সংস্কার করে কাজ চালানো যাবে বলে মনে করতেন না। তিনি প্রয়োজন বোধ করেছিলেন সম্পূর্ণ নতুন ধরনের দর্শনের। তিনি সে সময় গ্রীক দর্শন নিয়ে গবেষণা করছিলেন। গ্রীসের ইতিহাস থেকে নেওয়া একটি উপমার সাহায্যেই তিনি তার মনোভাবটি ব্যক্ত করেছিলেন। আথিনা শত্রুর কাছে পরাজয়ের মুখোমুখি হলে, বিভিন্নজন শত্রুকে বিভিন্নরকম ছাড় দিয়ে কোনোক্রমে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার পরামর্শ দিচ্ছিলেন। তখন 'জনগণের জেনারেল' টিমিথিউস আহ্বান করেছিলেন, 'আসুন নতুন কোনো স্থানে নতুন ধাতুতে আথিনাকে আবার গড়ে তুলি'। আমরা মার্ক্সের এ বক্তব্যটিকে পাই তার এপিকুরস সম্বন্ধে নোট বইয়ে। প্রকৃতপক্ষে তখন তিনি তার প্রস্তাবিত নতুন দর্শন উদ্ভাবনের সংকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত। আমরা দেখব, তার ডক্টরাল থিসিসে তিনি এ নতুন আথিনার (নতুন দর্শনের) ভিত্তি স্থাপন করে ফেলেছেন।

মার্ক্স এপিকুরসের প্রশংসা করেছেন, কারণ এপিকুরস আত্মচৈতন্যকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং বিজ্ঞানের নৈতিক ভিত্তি দিয়েছেন। এপিকুরসই পারিপার্শ্বিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও আত্মসচেতন নীতিনিষ্ট বিষয়ীকে বিশেষ অধিকার দিয়েছেন। মার্ক্সের বিবেচনায় 'এপিকুরীয় দর্শনে মৃত্যুই অমর। পরমাণু, শূন্যতা, আকস্মিকতা, যদৃচ্ছা (arbitrariness) এবং সংযুতি (composition)– এরা নিজেরাই মৃত্যু।' বিষয়টিকে ঘুরিয়ে বলা যায়, যা পরিবর্তনহীন বা অমর তা-ই মৃত। এপিকুরীয় দর্শনে দুটি প্রথমিক সত্তা হচ্ছে, অবয়ব (soma) এবং শূন্যতা। কিছু অবয়ব সংযুতি, আর কিছু অবয়ব মৌল কণিকা যা এসব সংযুতি গঠন করে; অর্থাৎ পরমাণু। পরমাণু ও শূন্যতা পরিবর্তিত হয় না। সংযুতি পরিবর্তিত হয়। পরমাণুদের সংযুক্তি ও বিযুক্তিই এ-পরিবর্তনের কারণ। এই সংযুক্তি ও বিযুক্তি ঘটে যদৃচ্ছ ও আকস্মিকভাবে; লৌহদৃঢ় আবশ্যিক নিয়মে নয়। কোনো বিশেষ সংযুতি পরিবর্তনশীল। সবসময়ই সংযুতির ভাঙ্গাগড়া চলতে থাকে। কিন্তু বিশ্বে সবসময় কোনো না কোনো সংযুতি রয়েই যায়। এপিকুরীয় দর্শনে তাই পরমাণু ও শূন্যতার মতোই একটি বর্গ হিসাবে সংযুতিও অমর। আর অমর পরিবর্তনের নিয়ম– আকস্মিকতা ও যদৃচ্ছা। কাজেই বলা চলে, অমর এসব বর্গসমূহের সবাই মৃত্যু। মৃত্যুর বিপরীতে জীবন হচ্ছে কোনো বিশেষ সংযুতি যা অনবরতই পাল্টে যায়। জীবন তাই এর মৃত পারিপার্শ্বিকেই জীবন্ত থাকে। এপিকুরস-এর মতে, এই মৃত্যুর প্রেক্ষাপটেই মানবিক চৈতন্যকে বিকশিত করতে হবে, মানবিক মুক্তি অর্জন করতে হবে। আমরা লক্ষ্য করি, যেখানে মার্ক্স-পূর্ব বস্তুবাদে অচেতন 'বিষয়'-ই (বস্তু) কেন্দ্রীয় বিষয়, সেখানে মার্ক্স সচেতন সক্রিয় 'বিষয়ী'কেই নিজের দর্শনের কেন্দ্রীয় বিষয়ে পরিণত করেন। এপিকুরস মানুষের মৃত্যু ও দেবতার ভীতি দূর করে ইহজাগতিক নৈতিকতা উপহার দিয়েছেন। বন্ধুত্বই তার জন্য সর্বোচ্চ শুভ। তার নৈতিকতার সারমর্ম, অন্যের ক্ষতি না করা এবং অন্য দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ না হওয়া। এর উপরই গড়ে উঠে সামাজিক চুক্তি, যা সমাজ বা রাষ্ট্রের ভিত্তি। এপিকুরসের এসব ধারণাসমূহ, রাষ্ট্র ও নৈতিকতা সম্বন্ধে ধর্মীয় ও রহস্যবাদী ধারণা দূর করে এসব বিষয়ে খাঁটি বিজ্ঞান সম্ভব করে তুলেছে।

প্রাচীন বস্তুবাদীদের সম্পর্কে এমন অভিযোগ করা হয়, তারা ইন্দ্রিয় সংবেদনকে জ্ঞান অর্জনের উৎস হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে চিন্তাকে 'নিষ্ক্রিয় সংবেদন'-এর স্তরে নামিয়ে এনেছেন। বিপরীতে প্রত্যক্ষণ-এর দ্বান্দিকতার সক্রিয় দিকটি বিকাশ করার কৃতিত্ব দেয়া হয় ভাববাদীদেরকে। মার্ক্স দেখিয়েছেন, এপিকুরস তার জ্ঞানতত্ত্বে জ্ঞানার্জনকে একটি সক্রিয় প্রক্রিয়া হিসাবেই বর্ণনা করেছেন। এপিকুরস-এর মতে সংবেদনের 'বিষয়'টি সবসময় পরিবর্তনশীল। কাজেই এটি তিরোভাবের মুহূর্তেই আবির্ভূত হয়। (কোনো অবয়ব থেকে এর প্রতিরূপসমূহ বিচ্ছুরিত হয়ে আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহে

আঘাত করে মিলিয়ে যায় ।) তাই কোনো কিছুর আবির্ভাব মানে তার সত্তা থেকে বিচ্ছিন্নতা। সংবেদ্য বিষয়টি তিরোভাবের সময়েই সংবেদ্য বলে, সংবেদন মানেই পরিবর্তনের সংবেদন। আর পরিবর্তন হিসাবে পরিবর্তনই তো সময়। তাই সংবেদন মানেই মূর্ত সময়। পরিবর্তনই সংবেদনের বিষয় বলে, সংবেদন একটি সক্রিয় প্রক্রিয়া। মানুষও প্রকৃতির অংশ। তাই সংবেদনে প্রকৃতি নিজেই নিজেকে অনুভব করে। সংবেদন ও সংবেদনের স্মৃতি থেকে ধারণা গড়ে উঠে। একবার গড়ে ওঠার পর, ধারণা সংবেদনকে সংগঠিত করে। সংবেদন ও ধারণা থেকে সক্রিয় চিন্তার মাধ্যমেই আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছাই। কোনো চিন্তার সঠিকতার মাপকাঠি যেমন এ-চিন্তার অনুসারী সংবেদন; তেমনি চিন্তার মাধ্যমে আমরা আমাদের সংবেদনের ত্রুটিকে শুধরে নিতে পারি। সংবেদন এবং চিন্তার এ দ্বান্দ্বিকতাই সংবেদনের নিশ্চয়তার দ্বান্দ্বিকতা। এপিকুরসের মতে জীবন-উপকরণ অর্জনের বস্তুগত অবস্থার বিবর্তনই আমাদের দুনিয়া সম্বন্ধে চেতনা বিকাশের কারণ। সবসময়ই জীবন উপকরণ অর্জিত হয় সমাজবদ্ধ মানুষের চেষ্টায়। মানুষের চেতনার বিকাশকে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ফল হিসাবে দেখলে, মানুষকে আর অতিপ্রাকৃত সৃষ্ট বলে মনে হয় না। এতে মানবিক জগৎ থেকে মানুষের বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটে।

মার্ক্স সমালোচনা করেছেন এপিকুরসের 'পরমাণুবাদী' দৃষ্টিভঙ্গির। মার্ক্সের মতে এপিকুরীয় প্রকৃতি-দর্শনের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হ'ল, এটি যাত্রা শুরু করে সংবেদনের জগৎ থেকে, সংবেদনকে সর্বোচ্চ প্রমাণ হিসাবে মান্য করে; কিন্তু নীতি হিসাবে ধরে রাখে পরমাণুর মতো এক বিমূর্ততাকে। এপিকুরীয় দর্শনে মূল সত্তা একটি নয়, দুইটি: পরমাণু ও শূন্যতা। এই পরস্পর বিপরীত দু'টি সত্তার একটিই সাধারণ বৈশিষ্ট্য: স্বাতন্ত্র্য। সত্তা দু'টি মিথষ্ক্রিয়ায় মিলিত হয় না; নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। এই স্বাতন্ত্র্যকেই মূলনীতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে এপিকুরীয় দর্শন পূর্ণতা পায়। এ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী প্রতিটি বিষয়ই বিমূর্ত ও স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে। এজন্য এপিকুরস আকস্মিকতাকে আবশ্যিকতার মধ্যে স্থাপন না করে, বিপরীতে স্থাপন করেন। ফলে তা বাস্তব জগতকে বুঝতে সাহায্য করে না; চিন্তাকারীর মনে প্রশান্তি আনে মাত্র। তার কাছে কোনো বিষয় এবং বিষয়টি সম্পর্কে ধারণাও (বিষয় ও বিষয়ী) বিচ্ছিন্ন। এজন্যই তিনি ধারণা হিসেবে পরমাণু এবং পদার্থ হিসাবে পরমাণুকে পৃথক করেন। তিনি সংবেদনকে জ্ঞান অর্জনের প্রথম ধাপ বলে স্বীকৃতি দেন। কিন্তু তিনি কোনো বিষয়ের কারণ অনুসন্ধানে গবেষণায় নিয়োজিত হন না। বরং নিজের দার্শনিক নীতি থেকে বিমূর্ত সম্ভবনার যুক্তি প্রয়োগে সিদ্ধান্ত টানেন। অর্থাৎ, তার কাছে জ্ঞান অর্জনটি কোনো কর্মের কিংবা পরিবেশের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়ার ফসল নয়; আত্মমগ্ন চিন্তার ফসল। 'পারমাণবিক নীতি' অনুযায়ী তার আত্মচৈতন্যও (ব্যক্তি) বিমূর্ত ও স্বতন্ত্র; সমাজিক সম্পর্কের যোগফল নয়। এজন্যই তার আত্মচৈতন্য বাস্তবতা থেকে বিচ্যুত। বিচ্ছিন্ন আত্মচৈতন্যকে পরমনীতি করতে গিয়ে তিনি স্বাধীন যুক্তিগ্রাহ্য প্রকৃতিকে অস্বীকার করেন। ফলে সব ধরনের বিজ্ঞানই অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই এপিকুরস-এর মুক্তি সত্তা থেকে মুক্তি; সত্তার মাঝে মুক্তি নয়। মার্ক্স দ্বান্দ্বিক যুক্তি প্রয়োগে দেখান, এপিকুরস তার দর্শনে দ্বান্দ্বিকতা প্রয়োগ করেছেন (যেমন, পরমাণুর বিচ্যুতির ব্যাখ্যায়, পরমাণুতে ও প্রতিভাসের জগতে গুণ উদ্ভবের ব্যাখ্যায়, সময়ের ও সংবেদনের ধারণায়)। কিন্তু তিনি 'পারমাণবিক' কিংবা খন্ডতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। মূর্ত সার্বিকতায় প্রতিটি বিষয়ই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত; বিযুক্ত নয়। তাই আবশ্যিকতা ও আকস্মিকতা, বস্তু ও ধারণা বিযুক্ত নয়। মানুষের কর্মে বস্তু ও ধারণার (বিষয় ও বিষয়ীর) সংযুক্তি মূর্ত হয়। মূর্ত সার্বিকতায় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত প্রতিটি বিষয়েরই আপেক্ষিক স্বাধীনতা থাকে। মানুষ এ মূর্ত সার্বিকতার অংশ। এ মূর্ত সার্বিকতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ততা এবং মানুষের আপেক্ষিক স্বাধীনতার জন্যই মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকৃতিকে জানতে পারে।

হেগেলের দর্শনে প্রকৃতির স্বকীয় সত্তা নেই। পরমভাব তার বিবর্তনের পথে আত্মবিযুক্ত হয়ে প্রকৃতির রূপ নেয়, আবার পরমভাব-এ রূপান্তরিত হওয়ার জন্য। মার্ক্সের নিকট প্রকৃতির স্বাধীন অস্তিত্ব রয়েছে। এর বিকাশের নিজস্ব দ্বান্দ্বিকতা রয়েছে। প্রকৃতি যুক্তিগ্রাহ্য। মানুষ প্রকৃতিরই অংশ। তাই মানুষের জানার মাধ্যমে প্রকৃতি নিজেকেই জানে। হেগেলের দ্বান্দ্বিকতার তিনটি মুহূর্ত, ধারণা প্রকৃতি ভাব। মার্ক্সের দ্বান্দ্বিকতায় তিনটি মুহূর্ত, প্রকৃতি ধারণা প্রকৃতি। যেমন, বিমূর্ত স্থানের নেতিকরণের মাধ্যমে পরমাণু অস্তিত্বশীল হয় এবং ওজনের জন্য (অন্য পরমাণুদের নির্ধারণে অধীনে) সরলরেখায় পতিত হয়। এটি একটি প্রাকৃতিক বিষয় এবং দ্বান্দ্বিকতার প্রথম মূহুর্ত। পরমাণুর এ আবশ্যিক গতিকে নেতি করে পরমাণু আকস্মিক বাঁক নেয় এবং নিজের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করে। এটি ঘটে অনির্দিষ্ট স্থানে ও কালে, তাই সংবেদনে ধরা পড়ে না। কাজেই এটিকে একটি ধারণা বলে চিহ্নিত করতে পারি। এটি দ্বান্দ্বিকতার দ্বিতীয় মুহূর্ত। সরল রেখায় পতন এবং আকস্মিক বাঁক নেওয়া গতি দুটির লব্ধি (সংশ্লেষণ বা নেতির নেতি) প্রকাশ পায় পরমাণুর বিকর্ষণে বা সরলরেখা থেকে বেঁকে যাওয়ায়। এটিও একটি প্রাকৃতিক বিষয় এবং দ্বান্দ্বিকতার তৃতীয় মুহূর্ত। মার্ক্স কিভাবে হেগেলের ভাববাদী দ্বান্দ্বিকতাকে বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিকতায় রূপান্তরিত করেন, এটি এর একটি উদাহরণ। এভাবে মার্ক্স দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শনের সূচনা করে, এপিকুরীয় ও হেগেলীয় আত্ম-নির্দেশক, আত্ম-পরিক্রমাকারী বিমূর্ততা থেকে দর্শনকে মুক্ত করে, দর্শনে প্রকৃতিবাদকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন। দর্শন, সচেতন কর্মের সহযোগী দর্শনে রূপান্তরিত হয়েছে।

এপিকুরসের আদর্শ, সমাজের অসংগতি থেকে সরে গিয়ে প্রশান্ত জীবনযাপন। বিপরীতে মার্ক্স সমাজের মধ্যে থেকেই সমাজে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনতে চান। (এ যেন, 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়,/ অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়/ লভিব মুক্তির স্বাদ।') যা আছে তাকে যা উচিত তাতে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যম, সচেতন বিষয়ীর সক্রিয়তা। এ বক্তব্যে অন্তর্লীন রয়েছে, 'মানুষ একটি রাজনৈতিক প্রাণী' ধারণাটি। মার্ক্স বলেন, 'দর্শনের ব্যবহারিকতাও তাত্ত্বিক বিষয়। এ-হ'ল এমন এক পর্যালোচনা, যা কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে এর সারসত্তা দিয়ে, কোনো নির্দিষ্ট বাস্তবতাকে কোনো আদর্শ-র মাধ্যমে পরিমাপ করে।' কিন্তু তিনি এ-ও জানেন, 'মানুষের মনের নিয়মটি এমনই যে, কোনো তাত্ত্বিক-মন নিজের মাঝে মুক্ত হওয়া মাত্র ব্যবহারিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, এবং সংকল্পরূপে তাত্ত্বিক জগতের পাতালপুরী ছেড়ে, তাত্ত্বিক-মনটির তত্ত্ব-বিহীন যে জাগতিক বাস্তবতা বিরাজিত, এর মুখোমুখি দাঁড়ায়।' ...(চলবে)